ভিশন ২০৪১: শিক্ষা, শিক্ষাক্রম, ও জাতীয় উন্নয়ন

*ড. কাজী শহীদুল্লাহ

একবিংশ শতাব্দীর উন্নত সমাজ গঠনে গুণগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ থেকে শুরু করে গত ৫০ বছর শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর মুখামুখি হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুসন্ধান মূলক (Inquiry) পদ্ধতির সংযোজন ও বাস্তবায়ন। অন্যদিকে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার শতভাগ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের ফলাফল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ২০১০ সালে মোট এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯,১২,৫৭৭ জন এবং ২০১৯ সালে মোট এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৬,৯৪,৬৫২ জন। গত ১০ বছরে মাধ্যমিক স্তরে এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভাগ বিবেচনায় গত দশ বছরে বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৫৯% মানবিক বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৪২% এবং বাণিজ্য বিভাগে ১২.০২% হ্রাস পেয়েছে। যার প্রতিফলন উন্নত রাষ্ট্র গড়ার অন্যতম উপাদান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল পেশাদার লোকের সংখ্যা অপ্রতুল ও উন্নয়নের জন্য কার্যকর দক্ষতা সম্পন্ন লোকবলের অভাব। যার অন্যতম কারণ গুণগত বিজ্ঞান শিক্ষার অভাব। গবেষণায় দেখা যায় যে, অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ ও পরিমার্জনের সাথে সংশ্লিষ্টদের কার্যকরভাবে অবহিত ও প্রস্তুত করা হয়নি। এজন্য, একবিংশ শতাব্দীর গুণগত শিক্ষা ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মানে বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

ড. কাজী শহীদুল্লাহ,
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস্ (বিইউপি)
kazishahidullah@gmail.com

ভিশন ২০৪১: শিক্ষা, শিক্ষাক্রম, ও জাতীয় উন্নয়ন

পটভূমি

বর্তমান সরকার জাতীয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ভিশন ২০২১, ২০৪১, ২০৭১, এবং ২১০০ (ডেল্টাপ্ল্যান) নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে, গত এক দশকে এসডিজি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, কৃত্তিম বুদ্ধিমাত্তা (AI), Big data, Machine Learning, ইন্টারনেট অব থিংস (Internet of Things-IOT), বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল (STEM), জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তাসহ অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করছে। একই সাথে, ২০১০ সালে বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশিত হয়। এসব বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট কোন চাহিদা কিংবা সময় অনুযায়ী শিক্ষাক্রম পরিমার্জন হয়ে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্দ্যোগে। আজ স্বাধীনতার ৫০তম বছরে আরেকটি নতুন শিক্ষাক্রমের আত্মপ্রকাশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু গত ৫০ বছরে শিক্ষাক্রম সমূহের অর্জন ও অপ্রাপ্তি দুটোকেই প্রকাশ ও বিবেচনায় আনার প্রয়োজন। শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন সাধারণত: দুইটি বিষয়ে বিবেচনা করা হয়। প্রথম বিবেচনা করা হয়, শিক্ষাক্রম ও শিখন-শিক্ষন পদ্ধতি ইত্যাদি। কিন্তু এই ইনপুট নির্দিষ্ট কোন ফলাফল (Outcome) এবং লক্ষ্য (Focus) নির্দিষ্ট করা কঠিন। দ্বিতীয়ত: পরিমার্জনের প্রভাব শ্রেনীকক্ষের শিখন-শিক্ষনে পরিবর্তন খুবই সময় সাপেক্ষ। সেজন্য শিক্ষাক্রমের পরিমার্জনের কর্মপন্থা চারটি ধাপে করা হয়- উদ্দেশ্য (Purpose), নীতি (Policy), কার্যক্রম (Program) এবং অনুশীলন (Practices) (Bybee, 1993, 2010, & 2013).

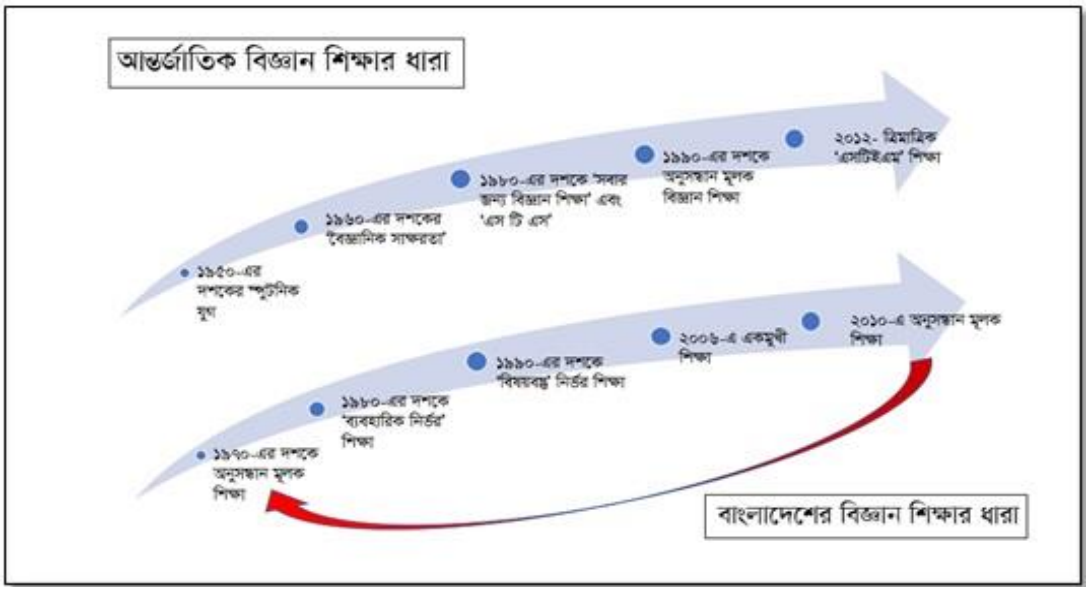

চিত্র ১ঃ শিক্ষা পরিমার্জনের তুলনা

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রেক্ষাপট

বর্তমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের অংশ হিসেবে শিক্ষাক্রমে কাঠামোর (Curriculum Framework) নির্দিষ্ট করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি, ২০২০)। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কর্মপন্থা (Action Plan) সাধারণত ১৫-২০ বছরে হয়ে থাকে (Bybee, 1993, 1997, & 2013)। তবে এ সময়কাল দেশ ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কম লাগতে পারে। তাই ২০৪১ সালের মধ্যম আয়ের দেশ হবার জন্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর এই শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কর্মপন্থা চারটি ধাপে পরিমার্জনের জন্য ২০ বছরের পরিকল্পনা প্রয়োজন- উদ্দেশ্য নির্ধারণ ১-২ বছর, নীতি নির্ধারণ ৩-৪ বছর, কার্যক্রম নির্ধারণ ৩-৬ বছর এবং অনুশীলনের জন্য ৭-১০ বছর প্রয়োজন(Bybee, 1993, 1997, & 2013)। গত ৫০ বছরে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সঠিক ধাপে, সঠিক ভাবে ও যথাযথ পেশাগত বিশেষজ্ঞ দিয়ে না করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের সাথে অপরিবর্তনীয়

যা কার্যকর উন্নয়নের বাঁধা স্বরূপ। সেজন্য কার্যকর শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের জন্য দরকার কার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তুতি।

অন্যদিকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের গণিত কিংবা বিজ্ঞানের ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হয় যা National Educational Assessment (NEA) নামে পরিচিত। ২০১১-২০১৭ সাল পর্যন্ত NEA রিপোর্ট পর্যালাচনা করে দেখা যায় যে গণিতের ফলাফল চরম ভাবে নিম্নগামী (সারণী ১)। ৫ম শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা ২০% এর নীচে প্রাথমিক স্তরের গণিতের নির্ধারিত যোগ্যতা (Competency) অর্জন করতে পেরেছে (সারণী ১)। আবার, মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানের পরিসংখানের তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে গত দশ বছরে বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৫৯%, কিন্তু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে। "Education For All (EFA)" যেভাবে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করেছে সেই অনুপাতে মাধ্যমিক স্তরে গুণগত বিজ্ঞান শিক্ষায় অবদান রাখতে পারেনি। বরং মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অধিকতর অংশগ্রহন শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা নয় বরং পেশাগত, সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে (সারণী ৩)। বর্তমানে ৩৯% বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট বেকার এবং অনেকেই কাংখিত মানের চাকুরী পায়নি (Rahman et. al., 2019) ।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক ফলাফল (২০১১-২০১৭)

সাল	**২০১১**		**২০১৩**		**২০১৫**		**২০১৭**	
যোগ্যতা→	১ম-২য় শ্রেণীর নীচে	৩য়-৫ম শ্রেণীর উপরে	১ম-২য় শ্রেণীর নীচে	৩য়-৫ম শ্রেণীর উপরে	১ম-২য় শ্রেণীর নীচে	৩য়-৫ম শ্রেণীর উপরে	১ম-২য় শ্রেণীর নীচে	৩য়-৫ম শ্রেণীর উপরে
বাংলা ৩য় শ্রেণী	৩২%	৬৮%	২৫%	৭৫%	৩২%	৬৮%	২৬%	৭৪%
গণিত ৩য় শ্রেণী	৫০%	৫০%	৪৩%	৫৭%	৫৯%	৪১%	৫৯%	৪১%
যোগ্যতা →	৫ম শ্রেণীর নীচে	৫ম শ্রেণীতে	৫ম শ্রেণীর নীচে	৫ম শ্রেণীতে	৫ম শ্রেণীর নীচে	৫ম শ্রেণীতে	৫ম শ্রেণীর নীচে	৫ম শ্রেণীতে
বাংলা ৫ম শ্রেণী	৭৫%	২৫%	৭৫%	২৫%	৭৭%	২৩%	৮৮%	১২%
গণিত ৫ম শ্রেণী	৮৬%	৩২%	৭৫%	২৫%	৯০%	১০%	৮৩%	১৭%
৫ম শ্রেণীতে মোট শিক্ষার্থী	২৪৫৭৯১৮		২৭৯৩০১৪		২৮৩৯২৩৮		২৬৯৬২১৬	

সারণী ১ঃ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক ফলাফল (BANBEIS, 2019)

বিভাগ ভেদে মাধ্যমিকের ফলাফল (১৯৯৮-২০১৮)

সাল	মোট		মানবিক		বিজ্ঞান		ব্যবসায় শিক্ষা	
	এইচ.এস.সি	এস.এস.সি	এইচ.এস.সি	এস.এস.সি	এইচ.এস.সি	এস.এস.সি	এইচ.এস.সি	এস.এস.সি
১৯৯৮	৪৭৯০২৮	৭২২৩০০	৩১১৯১০	৪৩১০৬২	৯০৪৫১	২৩৮৪৯৪	৭৬৬৬৭	৫২৭৪৪
২০০০	৪৭০৫৪১	৯১৮০৪৫	২৯০৪৪৫	৫২১৯১৬	১০৭৪০৬	২৭০৫২০	৭২৬৯০	১২৫৬০৯
২০০৩	৫০১৫০৭	৯২১০২৪	২৫৪৫৫৫	৪১৩৪২৪	১২৬০২১	৩০১৫০৫	১২০৯৩১	২০৬০৯৫
২০০৫	৪১৫০৮৮	৭৫১৪২১	২০৪৩১৩	৩০৭৩৩০	৯৬৫০০	২৩১৬১৩	১১৪২৭৫	২১২৪৭৮
২০০৮	৪৯৬১৩৯	৭৪৩৬০৯	২৪২০৯২	৩২৭২৮৮	৯৫৮০৫	১৭৬৮৮০	১৫৮২৪২	২৩৯৪৪১
২০১০	৫৮০৬২৩	৯১২৫৭৭	২৮৬৫৬৩	৩৯৩০৯৭	১০৬৫২৭	২০৩৯৯২	১৮৭৫৩৩	৩১৫৪৮৮
২০১৩	৮১৪৪৬৯	৯৯২৩১৩	৩৯৭৪৪৩	৩৯২১০৯	১৩৮৫৩৭	২২৬৩৩৭	২৭৮৪৮৯	৩৬৮৯৭১
২০১৫	৮৭৬৪৭৬	১১১০৮৬৮৩	৪৪৪৮৮৮	৪২৯৩০২	১৫১২৫৯	৩২১২১৪	২৮০৩২৯	৩৫৮১৬৭
২০১৬	১০০৭০৫৩	১৩০০২৮৪	৫১২৮৬০	৫২৮৬৭৩	১৯০৮৫১	৩৭৭৪৭৪	৩০৩৩৪২	৩৯৪১৩৭
২০১৮	১০৭২০২৮	১৬২৪৪২৩	৫৬৪২৩১	৭১৯৬৭৬	২৩৮৯০৩	৫০৩৫০৬	২৬৮৮৯৪	৪০১২৪১

সারণী ২ঃ বিভাগ ভেদে মাধ্যমিকের ফলাফল (BANBEIS, 2019)

এস.এস.সি'তে বিভাগ ভেদে পরীক্ষার্থী (২০১০-২০১৯)

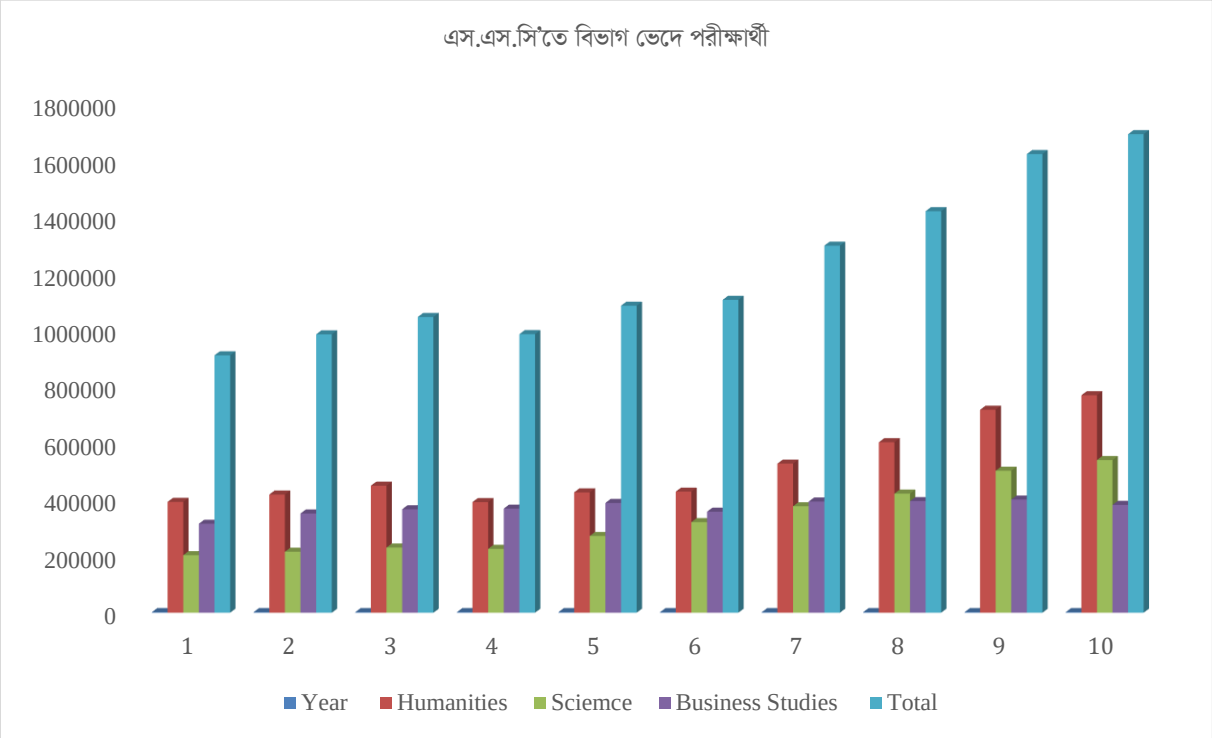

গ্রাফ ১ঃ এস.এস.সি'তে বিভাগ ভেদে পরীক্ষার্থী (BANBEIS, 2019)

শতকরা হিসেবে এস.এস.সি'তে বিভাগ ভেদে পরীক্ষার্থী (২০১০-২০১৯)

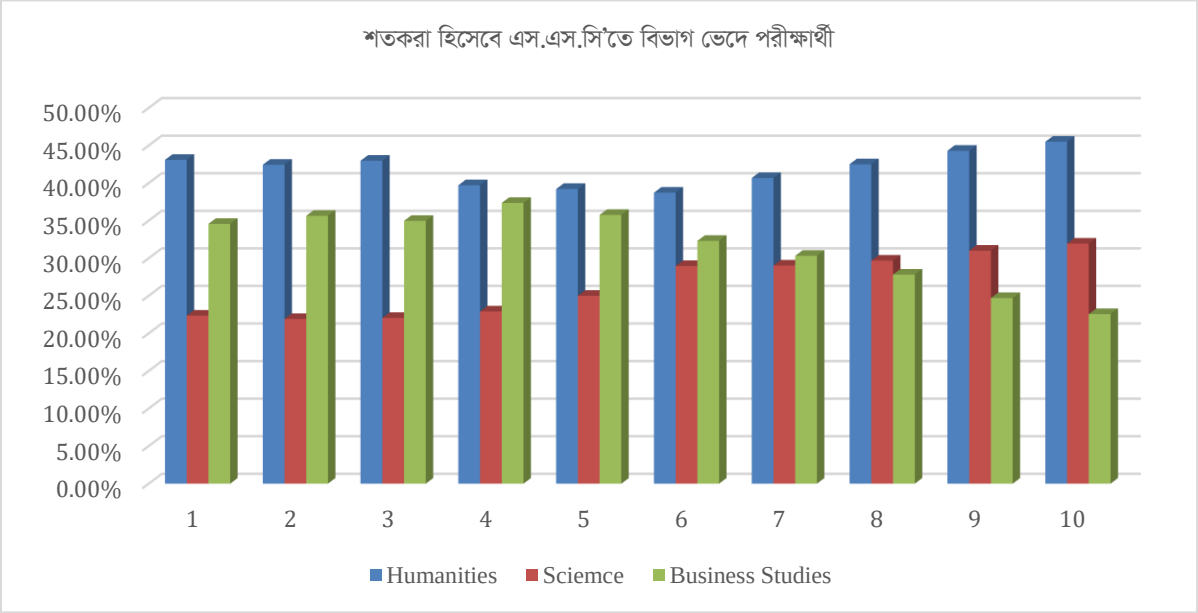

গ্রাফ ২ঃ শতকরা হিসেবে এস.এস.সি'তে বিভাগ ভেদে পরীক্ষার্থী (BANBEIS, 2019)

বিভাগ ভেদে এইচ.এস.সি ফলাফল (২০১০-২০১৯)

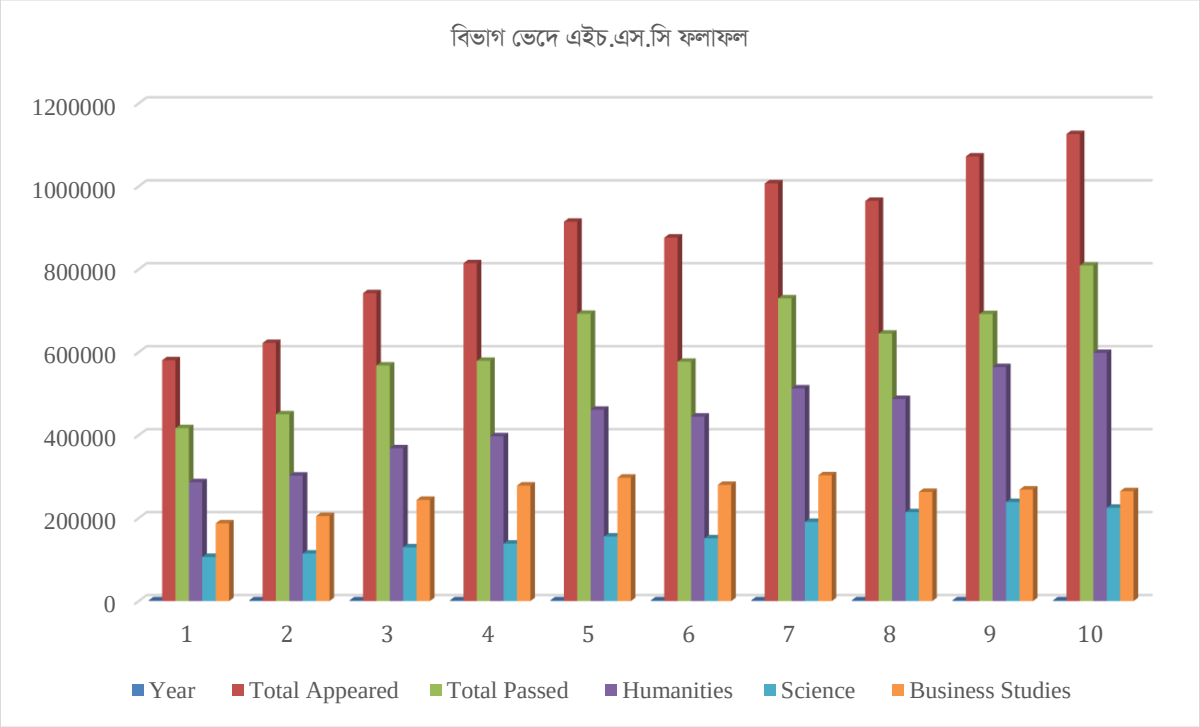

গ্রাফ ৩ঃ বিভাগ ভেদে এইচ.এস.সি ফলাফল (BANBEIS, 2019)

বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি'তে ভর্তির তুলনা (২০১০-২০১৯)

চিত্র ৪ঃ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি'তে ভর্তির তুলনা (BANBEIS, 2019)

উচ্চশিক্ষার তুলানামূলক ফলাফল (২০১১-২০১৭)

ডিগ্রী	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৬	২০১৭
বিএসসি	১৭৫২১	১৯৮৭২	১৭৯৮৩	১৬০৮১	১৭৫৯৮	২০০৩৭
বিএসসি (ইঞ্জি.)	৫৩৩৫	৬০০৪	৬৩৫০	৭০৯৩	৭৮৪০	৭৬৫৯
এমএসসি	১৫৩৬১	১৫৬১৭	১৬২৬৩	১৬৬৩৬	২০৬৯৩	১২৯৬৪
এমএসসি (ইঞ্জি.)	৫৮৮	৩৮৫	৬০২	৫৮১	৬০০	৬৩৭
পিএইচডি	৩৩২	৩৭৩	৩৭০	৪৮৮	৪৭৪	৪৪১

সারণী ৩ঃ উচ্চশিক্ষার তুলানামূলক ফলাফল (UGC, 2019)

পরিমাণগত শিক্ষা বনাম গুণগত শিক্ষা

"Education For All (EFA)" এবং "Millennium Development Goals (MDGs)" -এর মাধ্যমে গত তিন দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হয়েছে। এই দুইটি শিক্ষা ও উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্ঠা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার, শিক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (PEDP) ইত্যাদি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার শতভাগ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের ফলাফল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ২০১০ সালে মোট এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯,১২,৫৭৭ জন এবং ২০১৯ সালে মোট এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৬,৯৪,৬৫২ জন (সরণী ২, গ্রাফ ১)। গত ১০ বছরে মাধ্যমিক স্তরে এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভাগ বিবেচনায় গত দশ বছরে বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৫৯% মানবিক বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৪২% এবং বাণিজ্য বিভাগে ১২.০২% হ্রাস পেয়েছে (গ্রাফ ১)। অন্যদিকে, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প যেমন- Total Quality Improvement (TQI), Secondary Education Sector Improvement Project (SESIP) ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কিংবা শিক্ষাক্রম, বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতি, শিখন সামগ্রী, মূল্যায়ণ ব্যবস্থার সংস্কার, পরিমার্জন ও উদ্ভাবনে গুণগত পারদর্শীতা দেখাতে পারে নাই।

একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের জন্য Sustainable Development Goals (SDGs) মাধ্যমে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষাকে SDGs -এর চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার গুণগত শিক্ষার এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য Bangladesh Education Sector Plan (ESP): 2020/21-24/25 প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যেমন- Schools with manageable class size, Qualitied fetches with pedagogy training, Teachers and education personnel participating in Continuums Professional Development (CPD), Classes using supplementary learning materials, Learning aids, ICT resources এবং Schools with plan and application of formative assessment.

অন্যদিকে, 8th Five Year Plan -এ Education and Technology -এর সাব-সেক্টরে SDG4 বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকরী কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করতে বলা হয়েছে- Develop better tools to measure learning outcomes, Performing the examination and evaluation me that of student learning, Increase science enrolment, Introduction of Common Curriculum up to class X, etc. একই সাথে উচ্চ শিক্ষার কৌশল হিসেবে STEM Fields এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে Collaboration এর উপরও গুরুত আরোপ করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন উপাদান সমূহ ও মিথষ্ক্রিয়া

একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান চারটি উপাদান বিবেচনা করা হয়- শিক্ষাক্রম (Curriculum), নির্দেশনা (Instruction), মূল্যায়ন (Assessment) ও পেশাগত প্রশিক্ষণ (Professional Development) (National Research Council, 2012)। বিগত ৫০ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার যে প্রধান সমস্যা দূর করতে পারেনি তা হলো- নির্দেশনা (Instruction)। নির্দেশনার গতানুগতিক পদ্ধতির পরিমার্জনের ব্যর্থতার কারণে বর্তমান জটিলতার (Stagnant) সৃষ্টি হয়েছে যেমন- পাঠ্যবই কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক নির্ভর লেকচার ভিত্তিক শিক্ষা, বিষয় (Content) ভিত্তিক শিক্ষা, মূল্যায়ন ভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি। যার কারণে শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে- সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, তথ্য প্রযুক্তি বৈষম্য ইত্যাদি। একই সাথে, নির্দেশনা'র (Instruction) রুপান্তর (Transformation) করতে না পারার কারণে তথাকথিত অনুসন্ধানমূলক(Inquiry) শিক্ষা, সৃজনশীলতার নামে প্রহসন মূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি, আইসিটি নির্ভর শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি, একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে মাল্টি সেন্সরি শিক্ষা নিশ্চিত করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অংশগ্রহন নিশ্চিত করা ও সর্বোপরি প্রয়োগশীল শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার কথা বলা হয়ে থাকে। যা নামমাত্র বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষা হিসেবে চালূ আছে। যার ফলশ্রুতিতে সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিকতা, সততা, উদারতা সম্পন্ন নাগরিক তৈরী করতে পারছে না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি প্রধান সমস্যা হল মূল্যায়ন পদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে নির্দেশনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত ৫০ বছরে মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কিন্তু মূল্যায়ন পদ্ধতির সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। কারণ শিক্ষাক্রম-নির্দেশনা-মূল্যায়ন-পেশাগত উন্নয়ন এই চারটি উপাদানের আন্তঃসর্ম্পক কখনই দৃঢ়ভাবে বিবেচনা করা হয়নি। এ জটিলতা শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকেই যা আজ অবধি সমাধান করা হয়নি। ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়ন করতে না পারার অন্যতম কারণ হলো অনুসন্ধানমূলক (Inquiry) পদ্ধতি উপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরী ও বাস্তবায়ন করতে না পারা (Tapan, 2010)। এরই ধারাবাহিকতায় নৈব্যক্তিক মূলক প্রশ্ন, প্রশ্ন ব্যাংক, ব্যবহারিক পদ্ধতি, স্কুল বেসড এসেসমেন্ট (SBA) এবং সর্বশেষ "সৃজনশীল" মূল্যায়ন পদ্ধতি সংযোজন যা আজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসেছে। এর অন্যতম কারণ হলো নির্দেশনার সাথে মূল্যায়ন পদ্ধতির সম্পর্ক না বুঝতে পারা এবং বাস্তবায়ন করতে না পারা। যে কোন শিক্ষা পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্রম-নির্দেশনা-মূল্যায়ন-পেশাগত উন্নয়ন এই চারটি উপাদান সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বিবেচনা করে পরিমার্জন করা হলেও বাংলাদেশের শিক্ষা পরিমার্জনে শুধুমাত্র মূল্যায়ন পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে, অন্য উপাদানগুলো সব সময়ই ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। সৃজনশীল মূল্যায়ন পদ্ধতি'র চূড়ান্ত ব্যর্থতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত যে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির সমস্যা গভীরতর এবং এটা নির্দেশনা (Instruction) ব্যর্থতা থেকে হচ্ছে। কারণ নির্দেশনার সাথে মূল্যায়নের অন্তরনিহিত সম্পর্ক রয়েছে। একমাত্র নির্দেশনা পদ্ধতি পরিমার্জনের মূল্যায়নের মাধ্যমেই অন্য সমস্যাগুলোর যৌক্তিক সমাধান করা সম্ভব। আর বর্তমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে প্রযুক্তি নির্দেশনা হিসেবে একটি সম্ভাবনা এবং সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য শিক্ষাক্রম কাঠামো তৈরিতে বিশেষ বিবেচনা করা ও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা ব্যবস্থার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষাক্রম রূপরেখা বিনির্মানে নির্দেশনা ও শিখন-শিখানো প্রক্রিয়া। আমাদের দেশের প্রচলিত গতানুগতিক শিখন-শিখানোর অন্যতম উপাদান হলো হল-পাঠ্যপুস্তক, ব্লাকবোর্ড, এবং চক। শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে শিক্ষক-কেন্দ্রিক লেকচার পদ্ধতি। গত ৫০ বছরে এই ধরনের প্রচলিত গতানুগতিক মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা থেকে বের হয়ে আসার কথা বলা হলেও কার্যকর নির্দেশনার (Instruction) পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। যদিও কাগজে কলমে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষার্থী নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেও শিক্ষার্থী নির্ভর নির্দেশনার কোন কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন গত ৫০ বছরেও করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষাক্রমের পরিমার্জনের সাথে সাথে নির্দেশনা-মূল্যায়ন-পেশাগত উন্নয়নের প্রায়গিকদিক বিবেচনা করে কোন ধরনের কার্যকর কৌশল ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে গত ৫০ বছরে ব্যর্থ হয়েছে। একারণে আমরা দেখতে পাই যে স্বাধীনতার ৫০ বছরে একই সময়ে স্বাধীন দেশগুলো যখন মধ্য আয়ের দেশে পরিনত হয়েছে তখনও আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ঘুরপাক খাচ্ছি। যে কোন দেশের উন্নয়নের সাথে শিক্ষিত ও নির্দিষ্ট কর্মদক্ষতার সমাজ উন্নয়নের পূর্ব শর্ত যার ভিত্তি হল গুণগত শিক্ষা। আর গুণগত শিক্ষার পূর্ব শর্ত হলো কার্যকর নির্দেশনা।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে গুণগত শিক্ষা বলতে বিষয়বস্তুর (Content) পাশাপাশি পদ্ধতিদক্ষতা (Process Skills)-কেও শিখনক্ষেত্র (Learning Field) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পশ্চিমা শিক্ষাক্রমে পদ্ধতি দক্ষতা (Process Skills) সংযুক্ত করা হয়েছে নব্বইয়ের দশকে বর্তমানে তা বিবর্তিত হয়ে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল দক্ষতা নামে সংযুক্ত করা হয়েছে যা STEM Education নামে পরিচিত। একই সাথে, একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতা (21st Century Skills) নামে শিক্ষা পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই দুই ধরনের দক্ষতা একই সাথে সমাপতিত (overlap) হয় যা গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিমার্জন করার অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। শুধু নাম মাত্র ১০টি দক্ষতা-(১) সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skills), (২) সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative thinking skills), (৩) সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem solving skills), সিদ্ধান্ত গ্রহন দক্ষতা (Decision making skills), সহযোগীতা দক্ষতা (Collaboration skills), যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skills), বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global citizenship skills), জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability skills), স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management skills), মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills) . এই দশটি দক্ষতা যত সহজে একত্র করা হয়েছে তা তত সহজে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযোজন ও প্রয়োগ করা অত সহজ নয়। বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তুর সাথে এই দশ ধরনের দক্ষতার জন্য যে ধরনের নির্দেশনা'র (Instruction) প্রস্তুতি দরকার তা আমাদের নেই। দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের পূর্বশর্ত হলো অনুসন্ধানমূলক (Inquiry-based) শিক্ষাক্রম, যা বাংলাদেশ গত ৫০ বছরেও অর্জন করতে পারে নাই। এভাবে অনুপোযুক্ত অবস্থায় দক্ষতাভিত্তিক (Skill-based) নতুন শিক্ষাক্রমের সংযোজন হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রুপরেখা: ২০২০ ও চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষাক্রম কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পাঠ্য বিষয় নির্বাচন। নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত ১০টি শিখনক্ষেত্র- ভাষা ও যোগাযোগ, গণিত ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু, সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, জীবন ও জীবিকা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ১০টি শিখনক্ষেত্র নির্ধারনে যথাযথ যৌক্তিকতার অভাব রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিশেষ প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য বর্তমান শিক্ষাক্রম কাঠামো যৌক্তিক আকারে প্রকাশ করা হলেও শিখন ক্ষেত্র নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। নিম্নরূপ: (১) ভাষা ও যোগাযোগ: এই শিখনক্ষেত্রটি প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেনীর জন্য যৌক্তিক। কিন্তু ১২-১৪ বছরের জন্য বিষয়বস্তু যে ম্যাট্রিক্স দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে Discipline-গত টেক্সট পড়ার ও লেখার যথেষ্ট পরিমান দূর্বলতা রয়েছে যা তাদের একাডেমিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এর অন্যতম কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একাডেমিক ভাষার অভাব। যোগাযোগ ভিত্তিক ভাষার সাথে সাথে একাডেমিক ভাষার গুরুত্ব গত দুই দশকে শিক্ষাক্রম থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। (২) গণিত ও যুক্তি: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গণিত শিক্ষার অবস্থা খুবই নাজুক। ২০১৭ ও ২০১৯ সালের জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন গবেষণায় শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেনী স্তর অনুযায়ী অনেক দূর্বলতা বের হয়ে এসেছে। নতুন শিক্ষাক্রম কাঠামোতে এধরনের কোন তথ্য সংযোজন করা হয়নি কিংবা বিবেচনায় আনা হয়নি। দ্বিতীয়ত: শিক্ষাক্রমের আন্তর্জাতিকতা যেমন- PISA কিংবা TIMSS এর সাথে সামঞ্জস্যতার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। সর্বশেষ, আমাদের গণিত শিক্ষাক্রম খুবই গণণাভিত্তিক (Computational)। অন্যদিকে, গণিত শিক্ষাক্রমে ধারণা মূলক (Conceptual) গণিত শিখার জন্য নির্দেশনা'র পুরোপুরি ঘাটতি রয়েছে যা একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতা এবং STEM ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে প্রধান অন্তরায়। (৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: যদিও নতুন শিক্ষাক্রম কাঠামো চারটি ভিন্ন শিখনক্ষেত্রকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ নামে দুটি ভিন্ন বিষয়ে আলাদা পাঠ্য বিষয় হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে তার Disciplinary কোন ভিত্তি নেই। বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষা গত ৫০ বছর ধরে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পরিমার্জন করতে পারে নাই। তার অন্যতম কারণ হলো বিজ্ঞান শিক্ষার পরিমার্জনে মৌলিক ভিত্তি যেমন- অনুসন্ধান মূলক পদ্ধতি কিংবা শিখন যন্ত্রপাতি'র মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ'র অভিজ্ঞতা অর্জন বা বিজ্ঞানের প্রয়োগকে হাতে কলমে শিখার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় নাই। বরং ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে বিজ্ঞান বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: তথ্য ও প্রযুক্তি কম্পিউটার শিক্ষার একটি শাখা মাত্র। একবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন কম্পিউটিং দক্ষতা একটি প্রাথমিক জীবন দক্ষতা। এজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে আংশিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ। (৪) পরিবেশ ও জলবায়ু: এই বিষয়টি একটি যুগোপযুগী বিষয়। কিন্তু এর মধ্যদিয়ে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রস্তুতিকে ফুটিয়ে তোলা। পুরোপুরি প্রস্তুতি ছাড়া আসলে তা কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে তা ভেবে দেখার বিষয়। (৫) সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, জীবন ও জীবিকা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সূরক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি: এই সবগুলো বিষয় মূলত: সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষায়িত ক্ষেত্র। এগুলো মূলত: ব্যবহারিক এবং অনেকটাই শিক্ষক শ্রেনী কক্ষের মধ্য দিয়ে অর্জন করাবে। আলাদা ভাবে শুধু বই লিখে কিংবা পড়ে এধরনে দক্ষতা আজও অর্জন করা সম্ভব নয়।

শিক্ষাক্রমে দক্ষতা সংযোজনের চ্যালেঞ্জ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মক্ষম জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill), এবং নতুনত্ব (Innovation) খুবই গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। যদিও কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষা উনিশ শতকে আবির্ভাব হয় কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যুগোপযুগী জ্ঞান (Knowledge) ও দক্ষতার (Skill) সংযোজন ঘটানো হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গত কয়েক দশকে প্রচলিত কর্মমুখী ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা কারিকুলামে সংযোজন এবং টেকনিক্যাল ও ভকেশনাল স্কুলে পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এই সব গতানুগতিক কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। প্রচলিত কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গত এক দশকে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। যে কারণে সাধারণ শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উভয় শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন করতে হবে। গতানুগতিক ভাবে সাধারণ শিক্ষাক্রম শেষ করার পর মাধ্যমিক স্তর থেকে কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষা শুরু করা হয়। এজন্য দুই শিক্ষাক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য ও অগ্রগতি যৌক্তিক হতে হবে। অন্যদিকে, গবেষণায় দেখা যায় যে কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের সমাজে নেতিবাচক ধারনা রয়েছে। কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষাকে আমাদের দেশে

অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শিক্ষার চোখে দেখা হয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষাকে কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই উপযুক্ত শিক্ষাক্রম কাঠামোর মাধ্যমে এই দুই শিক্ষাপদ্ধতির দুরত্ব ও ভ্রান্ত ধারনা দূর করা সম্ভব। এজন্য শিক্ষাক্রম কাঠামোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ ও অগ্রগতির মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে কর্মমুখী শিক্ষা ৩১ টি ট্রেড এ সার্টিফিকেট দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড এ ভর্তি হয় এবং প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ভিত্তিক ট্রেডগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নগন্য (Maleque et. al., 2019) । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু মাত্র সার্টিফিকেট অর্জনের জন্যই শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হয়ে থাকে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এসব দক্ষতার সাথে শ্রম বাজারের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। বরং গতানুগতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই শ্রম বাজারে প্রবেশ নিশ্চিত করা অধিক জনপ্রিয়। এসব কিছু মিলে শুধুমাত্র 'জীবন ও জীবিকা' নামে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয় সংযোজন একটি আত্মঘাতী প্রচেষ্টা।

শিক্ষাক্রম একীভূতকরণ চ্যালেঞ্জ

সর্বশেষ শিক্ষাক্রম কাঠামোতে বিবেচিত বিষয় হলো- নবম-দশম শ্রেনীতে পঠিত শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষার জন্য আলাদা পঠিত বিষয় হিসেবে বাদ দেয়া। বর্তমানে ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত একীভূত শিক্ষা বিদ্যমান এবং ইহাকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত বর্ধিত করা (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা, ২০২০)। এধরনের সিদ্ধান্ত খুবই জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে ২০০৬ সালে কেন একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই তা এখানে প্রকাশ করা উচিত। পূর্বের একমুখী শিক্ষাক্রম বাতিল করে একযুগ পরে পুনরায় চালু করার যৌক্তিকতা কি? বরং এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা ও ব্যর্থতার প্রকাশ মাত্র। ইতিপুর্বে শুধু একমুখী শিক্ষাক্রম তৈরী করার জন্য কোটি টাকা অপচয় করা হয়। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে কিন্তু তা শুধুমাত্র শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে শুরু করা একটি ভুল কৌশল। একমুখী দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিমার্জনকে প্রশাসনিক পরিমার্জন দিয়ে শুরু করতে হবে। অন্যথায় এবার প্রচেষ্টাও পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘ দিনের পরিমার্জন প্রক্রিয়ার পুনঃপুন ব্যর্থতার সংশোধনের করার এটাই সঠিক সময়। করোনা পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থা হোক ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি। এজন্য নিম্নলিখিত শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম পরিমার্জন মডেল ও ধাপ অনুসরন করা যেতে পারে।

প্রথম ধাপে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা পরিমার্জন শুরু করার ক্ষেত্রে শিক্ষানীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে শিক্ষা পরিমার্জন সংঘটিত হয়েছে। যদিও শিক্ষা পরিমার্জনকে কখনই রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের পটভূমি হিসেবে বিবেচিত করা হয় নাই। সর্বশেষ, পাকিস্থান আমলে হামিদুর রহমান কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমি হয়। সর্বশেষ শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে ২০১০ সালে। আমাদের দেশে শিক্ষানীতি খুব ঘন ঘন বদলায়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও গত সাত দশকে মাত্র তিনটি শিক্ষানীতি চালু ও বাস্তবায়ন করেছে। এজন্য আমাদের এমন একটি শিক্ষানীতি চালু করা দরকার যা দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষানীতি তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের শিক্ষা এবং এই শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তৈরি মানুষগুলোই আমাদের ভবিষ্যতের উন্নত বাংলাদেশ গড়বে। তাহলে প্রথমেই আমাদের শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা, ও শিক্ষাক্রমের দর্শন ঠিক করতে হবে। উন্নত বিশ্ব বর্তমানে বিষয় ভিত্তিক (Content) শিক্ষা থেকে অনুসন্ধানমূলক, অনুসন্ধানমূলক থেকে ত্রি-মাত্রিক শিখন-ভিত্তিক STEM শিক্ষায় শিক্ষা দান করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ কিভাবে আগামী ২০ বছরে ঐ স্থানে পৌঁছতে পারে তার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষানীতি ও কৌশল প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয় ধাপে, শিক্ষার জন্য ভবিষ্যতের শিক্ষা নামে শিক্ষা আইন-২০৪১ সংসদে পাশ করা যেতে পারে। আইনটি পাশ হলে রাষ্ট্রের ও সরকারের উন্নত শিক্ষার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই আইনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। গত একদশকে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংকের ভোল্ট হতে অর্থ পাচার, বিদেশে বিভিন্ন ভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, রোহিঙ্গা শরণার্থী, উচ্চ শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি, যুগোপযোগী নিরাপত্তা জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ইত্যাদি। এসকল ক্ষেত্রকে বিবেচনা করে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যকে উন্নত রাষ্ট্র উন্নয়নে (State-building) নিয়োজিত করা যেতে পারে।

তৃতীয় ধাপে, শিক্ষাক্রমকে শিক্ষাব্যবস্থার নীল নকশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ভবিষ্যতের নাগরিক এবং নাগরিকের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ কার্যকরী শিক্ষাক্রমের কোন বিকল্প নেই। এজন্য শিক্ষাক্রমের দর্শন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বিষয়বস্তু নির্ভর

না হয়ে প্রক্রিয়া এবং দক্ষতাকেও প্রাধান্য দিতে হবে। এজন্য শিক্ষাক্রমের কাঠামো, পরিকল্পনা, ও বাস্তবায়নে অপেশাদার ও আমলাতান্ত্রিক পরিমার্জন থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে গতানুগতিক মডেল থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন মডেল (School-Based Curriculum Implementation)

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন পদ্ধতির বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের সাথে পেচিয়ে গেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডগুলোর বিকেন্দ্রিকরণ তার উদাহরণ। কিন্তু তবুও কৌশলগত দূর্বলতার কারণে বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (SBA) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন মডেলের সংযোজন একটি সময় উপযোগী পদক্ষেপ হবে। কার্যকরীভাবে শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন ছাড়া গুনগত শিক্ষা আশা করা যায় না। যদিও সময়ের সাথে সাথে স্থানীয় প্রশাসন কিংবা বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে কিন্তু শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন বিকেন্দ্রিকরণকে শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রিকরণের সাথে মিলিয়ে জটিল করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন ছাড়া, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন বিকেন্দ্রিকরণ ছাড়া একবিংশ শতাব্দীর কাংখিত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়।

একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাক্রম তৈরী ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের কোন বিকল্প নেই (Bolstad, 2004)। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাক্রম যেভাবে প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা হয় তা শিক্ষা প্রশাসনের এক কেন্দ্রিকতার প্রতিফলন। কিন্তু শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণ হলেন সম্মুখ যোদ্ধা। এক্ষেত্রে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম তৈরি ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। গতানুগতিক শিক্ষাক্রম তৈরির প্রক্রিয়ায় Top down approach ব্যবহার করা হয় যেখানে শিক্ষকের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কোন নিয়ন্ত্রন বা ক্ষমতা থাকে না। "One-Size-fits all" approach শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি একবিংশ শতাব্দিতে নিঃষ্ফল। সে তুলনায় উন্নত দেশে বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে Bottom up approach ব্যবহার করা হয় যেখানে শিক্ষাক্রম তৈরি ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়। এজন্য শিক্ষাক্রম প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়াও একটু আলাদা। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের পরিমার্জনকে বিবেচনায় নিয়ে একদল শিক্ষক তাদের বিদ্যালয়ে ও শ্রেনীকক্ষে সম্ভাব্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা পরিমার্জিত রুপে পরবর্তী শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে সংযুক্ত হয়। যা পরিমার্জন ও বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে।

তাহলে, বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কি? বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন হল শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শ্রেনী শিক্ষকের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। গতানুগতিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক প্রশাসনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কিংবা অন্যান্য বৈচিত্রকে খুব কমই বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষন-শিখন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকে না। যে কারণে বিদ্যালয় সমূহ আদর্শ মানুষ তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে না। বরং রাষ্ট্র শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকে একধরনের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে।

একবিংশ শতাব্দীর অনেক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মনে করেন শিক্ষক ও বিদ্যালয় হলো শিক্ষার্থীর উন্নয়ন ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি (Skilbeck, 2005).। প্রচলিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ভাবে একটি শিক্ষাক্রমকে বাস্তবায়নের নামে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত একক ভাবে নিয়ে থাকে যেখানে বৈচিত্রকে বিবেচনা করার সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে, বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থীর গুণগত শিক্ষা যেমন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, অনুরুপভাব বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সক্ষমতা তৈরি হবে। ফলস্বরূপ, শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের জন্য ক্ষেত্র এবং বিশেষজ্ঞ উভয় বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিমাবিশ্বে বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনেক আগে থেকেই কার্যকর। এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উপাদনসমূহকে এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা হয়। যেমন- শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে শিক্ষাক্রম শ্রেনীকক্ষে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করা হয়, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। এই মডেল বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে এক একটি বিদ্যালয়, কিংবা একগুচ্ছ বিদ্যালয়, কিংবা উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করবে যা জাতীয় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের দক্ষ বিশেষজ্ঞ কর্মী তৈরি করবে।

বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, ও শিক্ষা প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ একটি দল হিসেবে কাজ করে যাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে কাংখিত ফলাফল পেতে পারে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী যে ধরনের শিক্ষাক্রমে পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গুণগত শিক্ষার কথা বলা হয় তার অন্যতম কারণ হলো বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন মডেল না থাকা। এই মডেল বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্রম ও নির্দেশনার কার্যকারিতার যে অভাব আছে তা দূর করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, বিদ্যালয়-ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা সরকার বার বার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে তাও এর মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব। একই সাথে ত্রি-মাসিক, অনুসন্ধান মূলক নির্দেশনা পরিমার্জনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।

সর্বোপরি, বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলেই ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সরকার ও রাষ্ট্র কাজ করে যাচ্ছে তা অর্জন করা সম্ভব হবে। এজন্য একবিংশ শতাব্দী শিক্ষাকে অন্যতম উন্নয়নের প্রাথমিক উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা জাতীয় নিরাপত্তার অংশও। এ ধরণের গুরুতর ও স্পর্শকাতর বিষয়কে অপেশাদারী ব্যক্তি বর্গের হাতে ছেড়ে দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হচ্ছে। শিক্ষা, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা-ভিত্তিক উন্নয়ন করার জন্য যাবতীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মূলত আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক হওয়ায় একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। একই সাথে, শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের হাতে ন্যস্ত না করে বরং পদার্থবিদ, গণিতবিদ ও প্রকৌশলীদের বা অন্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও উন্নয়নের জন্য যুগোপযুগী ও কার্যকরী শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

Reference

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (২০২০), ***জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিব)***

BANBEIS (2018), Bangladesh Education Statistics Annual Report.

Bangladesh Planning Commission (2020), Bangladesh Education Sector Plan (ESP): 2020/21-24/25, Retrieved from https://www.globalpartnership.org/content/education-sector-plan-202021-202425-bangladesh

Bangladesh Planning Commission (2020), 8th Five Year Plan: 2020-2025. Retrieved from http://www.plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/68e32f08_13b8_4192_ab9b_abd5a0a62a33/2021-02-03-17-04-ec95e78e452a813808a483b3b22e14a1.pdf

Bolstad, R. (2004). *School-based curriculum development: Principles, processes, and practices.* Journal of curriculum studies, 31(1), 83-97.

Bybee, R. W. (2018). *STEM education now more than ever*. National Science Teachers Association.

Bybee, R. W. (2013). *The case for STEM education: Challenges and opportunities*. NSTA press.

Bybee, R. W. (2010). *The teaching of science: 21st century perspectives*. NSTA press.

Bybee, R. W. (1997). *Achieving scientific literacy: From purposes to practices*. Heinemann, 88 Post Road West, PO Box 5007, Westport, CT 06881.

Bybee, R. W. (1993). *Reforming Science Education. Social Perspectives & Personal Reflections*. Teachers College Press, 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027 (Hardcover: ISBN-0-8077-3261-3; paperback: ISBN-0-8077-3260-5).

Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. A. (Eds.). (2014). *STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research* (Vol. 500). Washington, DC: National Academies Press.

Keiny, S. (1993). *School-based curriculum development as a process of teachers' professional development*. *Educational Action Research*, *1*(1), 65-93.

Leonard, G. B. (1972). *The Transformation: A Guide to the Inevitable Changes in Humankind.* Delacorte Press.

Maleque, M. A., Rahman, S. M. H., Ahmed, S. S., Salahuddin, A. N. M., & Tithi, U. M. (2020). *A Study for Enhancing Enrolment and Acceptability of Dhakhil (Vocational) Course*. National Technical Education Board.

Marsh, C. (1990). *Reconceptualizing School-Based Curriculum Development*. Falmer Press, 1900 Frost Road, Suite 101, Bristol, PA 19007. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED335745.pdf

National Research Council. (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. National Academies Press.

National Curriculum and Textbook Board (2012), *National Secondary Science Curriculum.*

Posner, G. J. (1995). *Analyzing the curriculum*. McGraw-Hill Humanities Social.

Rahman, Tashmina; Nakata, Shiro; Nagashima, Yoko; Rahman, Mokhlesur; Sharma, Uttam; Rahman, Muhammad Asahabur. 2019. *Bangladesh Tertiary Education Sector Review : Skills and Innovation for Growth*. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31526 License: CC BY 3.0 IGO.

Rutherford, F. J., & Ahlgren, A. (1991). *Science for All Americans*. Oxford University Press.

Shahidullah, K. (2016), *Teachers Perception on Inquiry and STEM Education in Bangladesh.* Doctoral Dissertation, University of Nevada, Reno, 2016.; Publication Number: AAT 10161327. ProQuest Dissertations & Theses Global. http://scholarworks.unr.edu:8080/bitstream/handle/11714/2266/Shahidullah_unr_0139D_12144.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Skilbeck, M. (2005). *School-based curriculum development*. In The roots of educational change (pp. 109-132). Springer, Dordrecht.

Tapan, S. M. (2010). *Science Education in Bangladesh*, In J. Lee (Ed.), Handbook of Research in Science Education Research in Asia (Rev. ed., p.p. 17-34). Sense Publishers. Retrieved April 15, 2011, from https://www.sensepublishers.com/files/9789460910746PR.pdf.

Tyler, R. W. (2013). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago press.